শতাব্দীর মোহনায় সিডনি

প্রদীপ দেব

০৮

সারাহ্ আর তার বন্ধুরা চলে গেলো সকালে। তারা যাবার পরে আমিও বেরিয়ে পড়লাম। আজ সারাদিন ঘুরে বেড়ানোর প্ল্যান। ম্যাকডোনালড্স থেকে ব্রেকফাস্ট করে হাঁটতে শুরু করে দিলাম। সেন্ট্রাল রোড ধরে সোজা হাঁটতে হাঁটতে হাইড পার্ক। সিডনি সেন্ট্রালের সামনেই এই বিশাল হাইড পার্ক। ইংল্যান্ডেও নাকি একটা হাইড পার্ক আছে। বেশ সুন্দর পার্ক। বেশ কিছু মূর্তি আছে এখানে সেখানে। একটা সুন্দর ঝর্না আছে পার্কের মাঝখানে। অনেক মানুষ শুয়ে বসে আছে পার্কের ঘাসে, বেঞ্চে। পার্কের পাশ ঘেঁষে চলে গেছে ম্যাক্কুয়ারি স্ট্রিট। এই রাস্তা পার্ক থেকে শুরু হয়ে মিশেছে অপেরা হাউজে গিয়ে। কাছেই পার্লামেন্ট হাউজ, ট্রেজারী। হাইড পার্কে সুন্দর একটা মিউজিয়াম আছে। আগে নাকি এটা জেলখানা ছিলো। বিশাল একটা সিনেগগ রাস্তার ওপারেই। এর স্থাপত্য দেখার মতো। ধর্মের সাথে স্থাপত্যের একটা চমৎকার সম্পর্ক আছে। যে কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপত্যই দেখার মতো। পার্কের কাছেই এন্জেক মিউজিয়াম। এন্জেক হলো অস্ট্রেলিয়া এন্ড নিউজিলান্ড অক্সিলিয়ারি কর্পস্। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিলান্ডের অনেক মানুষ অংশ নিয়েছিলো। তাদের স্মরণে এই মিনার আর জাদুঘর। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শহীদদের নামও যোগ হলো এখানে। দেয়ালে অনেক নাম খোদাই করা আছে। শহীদদের নাম। শহীদ পরিবারের লোকজন এসে এখনো বাতি জ্বালিয়ে ফুল রেখে যায় এখানে।

হাইড পার্কে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে পিট স্ট্রিটে ঘুরলাম কিছুক্ষণ। সেখান থেকে সিডনি টাওয়ার পার হয়ে কুইন ভিক্টোরিয়া বিল্ডিং-এ ঢুকলাম। কিছুক্ষণ উইন্ডোশপিং করে গেলাম চায়না টাউনে। চায়না টাউনের পুরোটাই চায়নিজদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। মনে হয় যেন সিডনির ভেতর ছোট্ট একটা চীনা ভূখন্ড। তার একটু পরেই পেডি মার্কেট। এখানে সব অস্থায়ী দোকানের সমাবেশ। মাছ থেকে শুরু করে ইলেক্ট্রনিক্স পর্যন্ত সব কিছু পাওয়া যায় এখানে। মেলবোর্নের কুইন ভিক্টোরিয়া মার্কেটের মতো। এখানের দোকান পাট মেলবোর্নের মতো সুন্দর মনে হলো না খুব একটা। রাস্তায় বেরিয়ে দেখি মাথার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে মনোরেল। কাছেই স্টেশান। তিনডলার ভাড়া লাগে প্রতি ট্রিপের জন্য। সাতটা স্টপ। শহরের সবচেয়ে ব্যস্ত এলাকার ওপর দিয়ে চলে যায় এই মনোরেল। ট্রাফিক জ্যাম অনেক কমিয়ে দিয়েছে এই মনোরেল। শহর দেখার বেশ ভালো ব্যবস্থা। মেলবোর্নে শহর দেখার জন্য সিটি সার্কেল ট্রাম আছে। তার জন্য ভাড়াও লাগেনা। সিডনিতে ট্রাম নেই বললেই চলে। একটা মাত্র ট্রাম লাইন আছে, সেটা খুব একটা বেশি এলাকা কভার করতে পারেনা।

মনোরেলে একটা চক্কর দিয়ে নামলাম ডার্লিং হারবারে। শহরের পশ্চিম প্রান্তে ওয়াটার ফ্রন্টে অলস সময় কাটানোর চমৎকার জায়গা। প্রচুর রেস্টুরেন্ট। হাত বাড়ালেই সমুদ্র। সিডনি একোয়ারিয়াম, মেরিটাইম মিউজিয়াম, আর্ট গ্যালারী আর প্যানাসোনিক আইম্যাক্স থিয়েটার সব এখানে যেন পর পর সাজানো। আইম্যাক্স থিয়েটারে থ্রি-ডাইমেনশানাল সিনেমা দেখানো হয়। এর পর্দা পৃথিবীর সবচেয়ে বড়। মেলবোর্নেও আছে এই আইমেক্স থিয়েটার। কিন্তু এখনো দেখার সুযোগ হয়নি। আজ এখানে টিকেট কেটে ঢুকে পড়লাম ডকুমেন্টারী দেখার জন্য। হলে ঢোকার সময় একটা কালো চশমা দেয়া হয়। ত্রিমাত্রিক ছবি দেখার জন্য এই চশমা চোখে দেয়া দরকার। ডকুমেন্টারীর নাম 'গালাপাগোস্', ছোট্ট একটা দ্বীপ। চার্লস্ ডারউইন গিয়েছিলেন সেখানে তাঁর জীবদ্দশায়। তারপর তেমন আর কেউ নজর দেয়নি এদিকে। সম্প্রতি ডক্টর মিশেল নামে একজন প্রাণিবিজ্ঞানী গবেষণা করছেন এই দ্বীপের প্রাণিগুলো নিয়ে। প্রাগৈতিহাসিক এই প্রাণিগুলো দেখতে অনেকটা গিরগিটির মতো। ত্রিমাত্রিক ছবির কল্যাণে মনে হচ্ছে হাত বাড়ালেই ধরা যাবে এগুলোকে। ডক্টর মিশেল নামে ছিপছিপে এই তরুণীর সাহস দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। একদম হাতের দূরত্বে বসে ছবি আঁকছেন একশ বছর বয়সী বিশাল কচ্ছপের। এক একটার ওজন পাঁচ ছয় মণের কম হবে না। সাগর তলের অনেক রহস্যজনক প্রাণীর দেখা মিললো পর্দায়। হলের ভেতর পরিচয় হলো মেডিকেল স্টুডেন্ট মোহান্তের সাথে। সে ইন্ডিয়ান কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় তাদের তিনপুরুষের বাস। ভালো লাগলো তার সাথে কথা বলে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সে এসেছে সিডনির বর্ষবরণ অনুষ্ঠান দেখতে।

হল থেকে বেরিয়ে দেখি আকাশ আবার মেঘে ছেয়ে গেছে। সিডনির আকাশ ঘন ঘন মুড বদলায়। হাজার হাজার ট্যুরিস্ট এখানে। প্রতি বছর বিশ লাখ ট্যুরিস্ট আসে সিডনিতে। ইন্টারন্যাশনাল 'ট্রাভেল এন্ড লেইজার' ম্যাগাজিনের জরিপে দেখা গেছে শতকরা ৮৭ ভাগ ট্যুরিস্ট সিডনিকে অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে দর্শনীয় শহর মনে করেন। কাল রাতে সারাহ্ বলছিলো সিডনি শহর সম্পর্কে। ম্যাপ দেখে বোঝা যায় না এই শহরটা কত বড়। ক্ষেত্রফলের হিসেবে সিডনি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শহরগুলোর একটি। সিডনি শহরের ক্ষেত্রফল ১৫৮০ বর্গকিলোমিটার। লন্ডন শহরের সমান প্রায়। আর নিউইয়র্ক শহরের দ্বিগুণ। নিউইয়র্ক শহরের ক্ষেত্রফল ৭৮০ বর্গকিলোমিটার। আমস্টারডাম শহরের ক্ষেত্রফল মাত্র ১৬৭ বর্গকিলোমিটার আর বিখ্যাত প্যারিস - মাত্র ১০৫ বর্গ কিলোমিটার। সে তুলনায় সিডনি জায়েন্ট সিটি। এই শহরে মাত্র সাড়ে পঁয়ত্রিশ লাখ মানুষ বাস করে। সরকারি হিসাব মতে এখানে সাড়ে চৌদ্দলাখ বাসা আছে। অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে ঘনবসতি হলো সিডনিতে। তারপরও দেখা যাচ্ছে টোকিওর একজন বাসিন্দার চেয়ে ছয় গুণ বেশি জায়গা নিয়ে থাকে একজন সিডনিবাসী। সিডনি শহরে যারা থাকে তাদের প্রায় অর্ধেকেরই বয়স ২০ থেকে ৩৫ এর মধ্যে। সিডনি যুবকদের শহর। সিডনি শহরে নাকি ১৮০টি দেশের নাগরিক বাস করে, ১৪০টি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলে তারা। কালচারাল মেল্টিং পট এমনিতে বলা হয়না সিডনিকে।

হারবার ব্রিজে ওঠার জন্য হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম ব্রিজের গোড়ায়। সিঁড়ি আছে এখানে। সিঁড়ি বেয়ে অনেক উপরে ওঠার পরে ব্রিজের পায়ে হাঁটা পথ। ডান দিকে তাকালে পুরো

সিডনি শহর দেখা যাচ্ছে। সামনে অনেক নিচে অপেরা হাউজ মনে হচ্ছে পানির মাঝে ভেসে আছে। ব্রিজের ওপর দিয়ে দ্রুত বেগে চলে যাচ্ছে অসংখ্য গাড়ি। একটা ট্রেন এসে থামলো ব্রিজের ওপর স্টেশানে। সিডনি হারবার ব্রিজ, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় (সবচেয়ে লম্বা নয়) স্টিল ব্রিজ। সারাহ্‌র কথা মনে পড়ছে। কাল রাতে বেশ কিছু তথ্য দিয়েছে সে আমাকে এই ব্রিজ সম্পর্কে। ১৯২২ সালে এই ব্রিজ তৈরির জন্য আন্তর্জাতিক টেন্ডার দেয়া হয়। ছয়টি কোম্পানি বিশটি দরপত্র জমা দেয়। ১৯২৪ সালের ২৪ মার্চ তারিখে বৃটিশ ফার্ম ডোরম্যান লং এন্ড কোম্পানীকে ব্রিজ তৈরির কাজ দেয়া হয়। বাজেট ছিলো ৪২ লাখ ১৭ হাজার ৭২১ পাউন্ড ১১ শিলিং ১০ পেন্‌স। এই তথ্যগুলো এখন ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। এই ব্রিজের চীফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন ডক্টর ব্রাডফিল্‌ড। ডক্টর ব্রাডফিলডকে এই ব্রিজের পিতা বলা হয়। ১৯৩২ সালের জানুয়ারি মাসে ব্রিজের কাজ শেষ হয়। সেবছরই মার্চের ১৯ তারিখে ব্রিজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন নিউ সাউথ ওয়েলস্‌ এর প্রিমিয়ার জন লেং। শুরু হয় এক নতুন সভ্যতার। ৫০৩ মিটার লম্বা এই ব্রিজ ৪৯ মিটার চওড়া। আট লাইনে গাড়ি চলে এর ওপর দিয়ে। দুটো ট্রেন লাইন, একটা সাইকেল ট্র্যাক আর পায়ে হাঁটার ফুটপাত। হেঁটে পার হতে গিয়ে নিচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে ওঠে। অথচ অনেকেই এই ব্রিজের উপরে লোহার সিঁড়ি বেয়ে ওঠে। রেগুলার এই ব্রিজ ক্লাইম্বিং চলে এখানে। পাঁচ ডলার দিতে হয় তার জন্য। আমার সাহস নেই অত উপরে ওঠে ব্রিজ পার হবার। কিন্তু সাহসী মানুষের অভাব নেই। ব্রিজ ক্লাইম্বিং অফিসে ভীড় লেগে আছে।

হারবার ব্রিজকে আদর করে কোট হ্যাঙ্গার নামেও ডাকা হয়। দূর থেকে দেখতে বিশাল একটা কোট হ্যাঙ্গারের মতোই লাগে এটাকে। সমুদ্র সমতল থেকে এই ব্রিজের উচ্চতা ১৩৪ মিটার। প্রায় ষাট লাখ স্ক্রু লাগানো হয়েছে এই ব্রিজে। সব স্ক্রু নাকি হাতেই লাগানো হয়েছে। ৫২ হাজার ৮০০ টন ইস্পাত ঝুলে আছে এই ব্রিজে। ব্রিজ তৈরির পরে প্রথম তিনবার পেইন্ট কোটিং করতে রং লেগেছে দু লাখ বাহাত্তর হাজার লিটার। এ ব্রিজে প্রতিদিনই রং করা হয় কোন না কোন অংশে। সারাবছর ধরেই এ প্রক্রিয়া চলে। ব্রিজের মেইনটেইনেনসের জন্য একাজ খুব জরুরী। ব্রিজের যে সমস্ত অংশে রং লাগাতে হয়, সব মিলিয়ে তার মোট ক্ষেত্রফল হিসেব করলে তা ষাটটি বড় বড় স্টেডিয়ামের ক্ষেত্রফলের সমান হবে। সারাবছর গড়ে দৈনিক প্রায় দেড় লাখ গাড়ি পার হয় এই ব্রিজের ওপর দিয়ে। ব্রিজের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে হেঁটে গেলাম। এপারে খুব বেশি কিছু নেই। আবাসিক এলাকায় কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে চলে এলাম আবার।

রাত হয়ে যাচ্ছে। কাল চলে যাবো মেলবোর্ন। আজ সারাদিন হেঁটেছি। পা টনটন করছে এখন। ক্ষুধাও লেগেছে খুব। একটা চায়নিজ রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়লাম। মনে হচ্ছে সিডনি শহরের অনেক কিছুই দেখা হয়ে গেলো। অনেক কিছুই বাদ রয়ে গেছে যদিও, তবুও মনে হচ্ছে মেলবোর্ন এর চেয়েও সুন্দর। কেন মনে হচ্ছে জানিনা, হয়তো আমি মেলবোর্নে থাকি বলেই। হাঁটতে হাঁটতে আবার কিং ক্রস। আলো ঝলসিত রং মাখা সং সাজা সভ্যতার দেউলেপনা দেখতে দেখতে ঘরে ফেরা। আজ সারা ঘরে আমি একা।

০৯

আমি মনে করেছিলাম আমার বাস সকাল সোয়া দশটায়। সে হিসেবে আটটার দিকে ঘুম থেকে উঠে ব্যাগ গুছাতে গিয়ে টিকেটে চোখ বুলিয়ে আমার চোখ ছানাবড়া হওয়ার জোগাড়। সোয়া নয়টায় বাস আমার। তাড়াহুড়ো কাকে বলে আর কত প্রকার! কিংক্রস থেকে আরাম করে হেঁটে সেন্ট্রালে আসার সময় আর নেই। রাস্তা পার হয়েই কিং ক্রস আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেন স্টেশান। কয়েকমিনিট পর পর সিটি সার্কেল ট্রেন। সেন্ট্রাল স্টেশানে পৌঁছাতে খুব একটা দেরি হলোনা। কাল সিটিতে ঘুরে সিডনির রাস্তা ঘাট সবকিছু চিনি এরকম একটা ভাব চলে এসেছিলো আমার। কিন্তু এখন ট্রেন থেকে বের হয়ে হাঁটছি তো হাঁটছিই। স্টেশান থেকে বেরুবার রাস্তা আর খুঁজে পাইনা। একটা সুড়ঙ্গ পথে হাঁটছি আরো অনেকের সাথে। শেষ পর্যন্ত যেখানে বেরুলাম সেখান থেকে সেন্ট্রালের লেজও দেখা যাচ্ছেনা। কিলবিল করে মানুষ বেরুচ্ছে মাটির নিচের গর্ত থেকে যেটা দিয়ে একটু আগে আমিও বেরিয়েছি। কোথায় এলাম আমি!

হাতে সময় আছে মাত্র পনেরো মিনিট। এখনো চেক ইন করা, বোর্ডিং পাস নেয়া কিছুই হয়নি। বাসের নিয়ম অনুযায়ী বাস ছাড়ার কমপক্ষে পনেরো মিনিট আগে রিপোর্ট করার কথা। হেঁটে হেঁটে পথ খুঁজে বের করার সময় হাতে নেই। একটা ট্যাক্সি নিলাম। চায়নিজ ট্যাক্সিওয়ালাকে সেন্ট্রাল স্টেশানে যাবো বলার পরে মাথা নেড়ে স্টার্ট দিলো ট্যাক্সিতে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে যখন মোড়টা ঘুরলো আমার নিজেকে একটা থাপ্পড় লাগাতে ইচ্ছা করলো। মোড়টা আমি হেঁটে দুমিনিটে ঘুরতে পারতাম। আর মোড় ঘুরলেই আমার বাসস্টপ। কিন্তু কোন কিছু ভালো ভাবে না চিনলে এরকম আক্কেল সেলামীতো দিতেই হবে। ট্যাক্সিওয়ালা আমার তাড়াদেখেই ঘোষণা করলো তার কাছে খুচরো ডলার নেই। ফেরত নেবার সময় নেই আমার। ব্যাগটা নিয়ে এক দৌড়ে টিকেট কাউন্টার।

আগে ভাগে এসে গেলে দেখা যায় গাড়ি ছাড়তে দেরি হয়। কিন্তু যখন তাড়াহুড়ো হয়, তখন গাড়িও পারলে সময়ের আগেই ছেড়ে দেয়। মার্‌ফির সূত্র। দেখা গেলো বাসে সব যাত্রী উঠে বসে আছে, যেন আমার জন্যই অপেক্ষা করছে। আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বাসে উঠে বসার প্রায় সাথে সাথেই ড্রাইভারের স্বাগত ভাষণ শুরু হয়ে গেলো। মেলবোর্নের বর্ণনা দিচ্ছেন, পথে কোথায় কোথায় থামবে তা বলছেন। গাড়ি চলতে শুরু করেছে। আস্তে আস্তে পেছনে চলে যাচ্ছে সিডনি সিটি, হাইড পার্ক, সিডনি টাওয়ার। যৌক্তিক বিচারে একবিংশ শতাব্দী এখনো না এলেও সবাই একবিংশ শতাব্দীকেই বরণ করে নিয়েছে এই সিডনিতে শতাব্দীর মোহনায় দাঁড়িয়ে। গতি বাড়ছে বাসের।